রক্তবীজ

পিটার ট্রিমেন

রূপান্তর
খসরু চৌধুরী

ঐতিহ্য

অনুবাদকের উৎসর্গ

রাহাত আফজা টুইজলি
সেই যে আমার নানা রঙের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ড্রাকুলা বংশ

ওয়ালাচিয়ার যুবরাজদের রাজত্বকাল

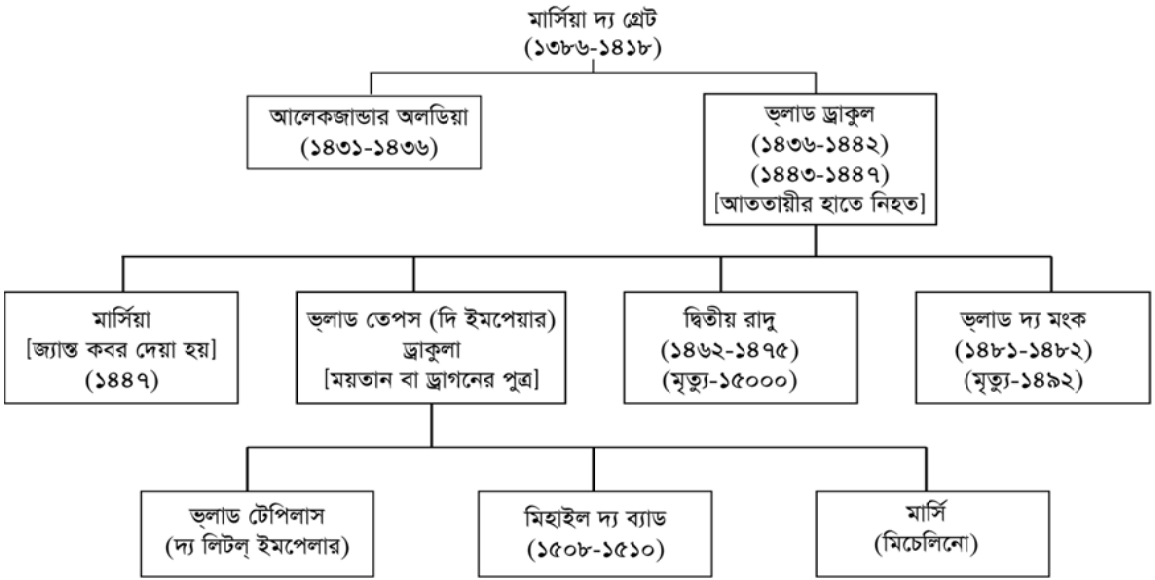

প্রথম পর্ব
ওয়ালাচিয়া অভিমুখে

এক

উৎসব শেষ। শ'তিনেক অতিথির কয়েকজন মাত্র আছে। মদে গোসল করার মতো অবস্থা তাদের। এই সুযোগ। সিনজিয়ার হাত ধরে চলে এলাম প্রাসাদের পিছনের বাগানে। আকাশে গোলাকার চাঁদ। স্নিগ্ধ আলোয় ভেসে যাচ্ছে বাগান। বাতাসে ভাসছে ফুলের পাগল করা সুগন্ধ।

'গিলিয়ানো বজ্জাতটার জন্যে এতক্ষণ আটকা পড়েছিলাম। ওটা একটা শুয়োর।' সিনজিয়ার চোখে আলো ঠিকরে বেরুল, 'দিন দিন অসহ্য হয়ে উঠছে একেবারে।'

'আমি কিন্তু গিলিয়ানোর মতো বজ্জাতি করব না। তোমার জন্যে আমি সবকিছু করতে পারি।'

'জানি,' হাত বাড়িয়ে আমার একটা হাত ধরল সে।

প্রকৃতির রূপ কতক্ষণ পান করেছিলাম জানি না। ভাবছিলাম, এ পরকীয়া ভালোবাসা কোথায়, কোন পথে নিয়ে যাবে আমাদের কে জানে! ওর স্বামীটা একটা বদমাশ। যখন তখন অত্যাচার করে ওর ওপর। ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যে সে পারে না এমন কাজ নেই। সবসময় মনে করে ওর চাওয়া-পাওয়াটুকু পূরণ হলেই হলো। স্ত্রীর যে আলাদা কোনো চাহিদা, কোনো দাবি থাকতে পারে, এটা সে চিন্তার মধ্যেও আনে না। তাই মনের জ্বালা জুড়োতে আমার কাছে ছুটে আসতে হয় সিনজিয়াকে।

'বেজন্মা কুত্তা!' অন্ধকারে হিসহিস করে উঠল লুসিনোলোর গলা। দু'জন দু'দিকে ছিটকে গেলাম। আমার কলার চেপে ধরল লুসিনোলো, 'আজ তোর একদিন কি আমার একদিন!' আমার এক প্রচণ্ড ঘুসিতে ছিটকে পড়ল প্রিন্স গিলিয়ানো লুসিনোলো। কোমর থেকে তলোয়ার টেনে বুকে বসাতে যাব, থেমে গেলাম সিনজিয়ার আর্তচিৎকারে।

'বেজন্মা কুত্তা!' আবার হিসহিস করে উঠল লুসিনোলো।

তলোয়ারের হাতল দিয়ে ঘা দিলাম মাথার পাশে। পড়ে গেল সে। অজ্ঞান।

কাগজের মতো সাদা হয়ে গেঠে রাজকুমারীর মুখ। 'হায়, ঈশ্বর! আমাকে নির্ঘাত খুন করবে গিলিয়ানো।'

আমি ওকে নিজের দিকে টানলাম। চুমু খেলাম হাতের উল্টোপিঠে। এমনি সময় বাগানের দিকে আসতে দেখা গেল মাতাল অতিথিদের।

' লুসিনোলো, লুসিনোলো।'

ঢোক গিলল সিনজিয়া। 'সর্বনাশ, এখনই পালাও! ওই যে প্রাচীর। ওই দিক দিয়েই যাও। দেরি কোরো না।'

নিচু হয়ে আবার চুমু খেলাম। নরম হাতটা মুঠোর মধ্যে নিয়ে আলতো চাপ দিলাম। পরের মুহূর্তেই দৌড়ে গিয়ে একলাফে প্রাচীর পার হয়ে ওপারে।

আর যাব না লুসিনোলোর প্রাসাদে। বড় বাঁচা বেঁচে গেছি এ যাত্রা।

বাঁচার কথা ভাবলাম সত্যি: কিন্তু তখন যদি জানতাম, আমার জন্যে কী অপেক্ষা করে আছে!

দুই

পালাজোতে ফিরেই চিঠি পেলাম একটা। মনোগ্রামযুক্ত মোমের সিল দিয়ে মুখ বন্ধ। মনোগ্রামটার দিকে ভালো করে লক্ষ করেই আঁতকে উঠলাম। এই মনোগ্রাম আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। চিনতেন আমার স্বর্গবাসিনী মা-ও।

গোল একটা বড় মুদ্রার সমান সিল। মাঝখানে একটা গাছ। গাছের একপাশে রাজা, অপর পাশে রানীর আবক্ষ মূর্তি। সিলের চারপাশে স্লেভনিক ভাষা। ওপরে আমার আসল নাম—মার্সিয়া। চমৎকার ল্যাটিনে লেখা চিঠি।

ক্যাসল ড্রাকুলা
পুনারী
২ জানুয়ারি, ১৪৭৭

ভাই মার্সিয়া,

ভাবতে দুঃখ হয়, ভাই হয়েও তোমার কাছে চিঠি লিখছি এই প্রথমবারের মতো। আমাদের বাবা, ড্রাকুলা, ওয়ালাচিয়ার রাজকুমার, মারা গেছেন। ভাই মার্সিয়া, মা-ও গত হয়েছেন। আগের সব কথা ভুলে প্রাসাদে আমাদের কাছে চলে এসো। এটা তো তোমার নিজেরই বাড়ি।

দীর্ঘ ষোলো বছর তোমার সঙ্গে কোনো দেখা সাক্ষাৎ নেই। এই ক্যাসল ড্রাকুলা, বিষয়-সম্পত্তি, এমনকি ওয়ালাচিয়া রাজ্যেও তোমার অংশ আছে। তুমি এসে তোমার ভাগ বুঝে নাও।

ভালোয় ভালোয় এখানে চলে এসো, এই কামনা করে শেষ করছি।

ইতি—
তোমার দু'ভাই
ভ্‌ল ও মিহাইল।

চিঠিটা নিয়ে বসে থাকলাম অনেকক্ষণ। প্রায় বিস্মৃত অতীত জেগে উঠল আস্তে আস্তে। ইতিহাস মানি যেহেতু, অস্বীকার করার উপায় নেই, আমিও একজন ড্রাকুলা। আমরা চেঙ্গিজ খাঁর বংশধর। বাবা ছিলেন ওয়ালাচিয়ার পঞ্চম যুবরাজ। তাঁর পরিচিতি ছিল ভ্লাড তেপ্স্ নামে।

প্রাচীন জার্মানির স্ক্যাসবার্গ শহরে বাবার জন্ম। দাদা, দ্বিতীয় ভ্লাড ওখানে তখন নির্বাসনে। ১৪৩৬ সালে দাদা যখন ওয়ালাচিয়ার শাসক হলেন, তাঁর নাম হলো ভ্লাড ড্রাকুল। 'ড্রাকুল' বলতে ড্রাগন বোঝাত। অবশ্য 'ড্রাকুল' মানে শয়তানও হয়। ফলে বাবার পরিচিতি হয় ভ্লাড ড্রাকুলা নামে। অর্থাৎ শয়তান বা ড্রাগনের পুত্র।

দাদা ওয়ালাচিয়ার শাসক থাকাকালীন তুরস্কের সঙ্গে তাঁর গভীর মৈত্রী স্থাপিত হয়। কিন্তু আশপাশের কেউ দাদার এই তুর্কি আঁতাত মেনে নিতে পারেনি। কারণ, ছোটখাটো রাজ্যগুলো প্রায়ই তুরস্কের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হতো। তুর্কিরা বাবা এবং চাচা রাদুকে তুরস্কে নিয়ে যায়। তুরস্কের সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ কসোভোয় যুদ্ধে ভ্লাদিস্পাভকে হারানোর পর ১৪৪৮ সালে বাবাকে সিংহাসনে বসান।

তিনমাস পুতুল শাসনকর্তা থাকার পর বাবা পালিয়ে যান মোলদাভিয়াতে এবং সেখানকার যুবরাজ স্তেফান সেল্ মেয়ারের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। ১৪৫১ সালে দ্বিতীয় মুরাদ কনস্টান্টিনোপ্‌ল আক্রমণ করেন। রাজা দ্বাদশ কনস্ট্যান্টাইন পরাজিত এবং নিহত হন। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য অন্ধকারের অতলে নিক্ষিপ্ত হয়।

তুর্কি আধিপত্য বাবাকে এমন পাগল করে তুলেছিল যে তিনি দাদার হত্যাকারী হাঙ্গেরীর রাজা ম্যাথিয়াস কর্ভিনাস ও তাঁর বাবা ট্র্যানসিলভেনিয়ার ইয়ান্স দ্য হুনদোয়ারার কাছে নিজেকে সঁপে দিতেও দ্বিধা করেননি।

১৪৫২ সালে ট্র্যানসিলভেনীয় সৈন্যদের সমর্থনপুষ্ট হয়ে বাবা ওয়ালাচিয়া আক্রমণ করে ট্রিগসরের নড়বড়ে শাসনের অবসান ঘটান। দখল করেন সিংহাসন। ওয়ালাচিয়ানদের কথা দেন, রাজ্যে কেউ গরিব থাকবে না। সবার অবস্থার পরিবর্তন করা হবে।

শত্রুদের প্রতি বাবা ছিলেন চরম নিষ্ঠুর। বিশেষ করে স্যাক্সন বণিকদের প্রতি। তারা বাবার বিরুদ্ধে জোট পাকানোর চেষ্টায় ছিল। ১৪৫৮ সালে তিনি মোহাম্মদ পাশার এবং পরে নিকোপোলিসের হামজা বেগের আক্রমণ প্রতিহত করেন। যোদ্ধা হিসেবে তাঁর সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। দানিয়ুবের দক্ষিণ পর্যন্ত বাবার আধিপত্য বিস্তার লাভ করে।

১৪৫৬ সালে সুলতান মোহাম্মদ ওয়ালাচিয়া দখলের জন্যে উঠে পড়ে লাগেন। প্রথম দু'একবার ঠেকাতে পারলেও শেষমেশ বাবাকে বিতাড়িত হয়ে ট্র্যানসিলভেনিয়াতে আত্মগোপন করতে হয়। মনে গোপন আশা, আবার হাঙ্গেরীর রাজা ম্যাথিয়াস কর্ভিনাসের সাহায্য নেবেন। কিন্তু স্যাক্সনদের প্রতি বাবার অত্যাচারের ফলে কর্ভিনাস ছিলেন ক্ষুব্ধ। হাঙ্গেরীর অর্থনীতিতে প্রচুর অবদান ছিল স্যাক্সনদের। কর্ভিনাস হাঙ্গেরীর রাজধানী বুদার পার্শ্ববর্তী শহর পেস্টে বাবাকে বারো বছর বন্দী করে রাখেন।

মা ছিলেন বাবার দ্বিতীয় স্ত্রী। ১৪৫৪ সালে বাবার সঙ্গে মার বিয়ে হয়। প্রথম স্ত্রীর দু'টি সন্তান। ভ্লাড ও মিহাইল। মিহাইলের জন্ম দিতে গিয়ে তিনি মারা যান। ১৪৬২ সালে মা আমাকে নিয়ে রোমে চলে যান। আমার বয়স তখন মোটে ছ'বছর।

বাবা ছিলেন ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর। একেবারেই ধর্ম-বিদ্বেষী লোক। তাঁর শাসনামলে ওয়ালাচিয়ার পাহাড় পর্বতে কোনো সাধু-সন্ন্যাসী সুখে বসবাস করতে পারেনি। সেন্ট বার্থলোমিউয়ের গির্জা তিনি পুড়িয়ে দেন। এমন ঘটনা শত শত আছে।

একবার ময়লা-ছেঁড়া কাপড় পরা এক কৃষককে দেখে বাবা প্রশ্ন করেন কৃষকটির বিয়ে হয়েছে কি না। বিবাহিত শুনে বললেন, বউয়ের অলসতার জন্যেই কৃষকটির কাপড়-চোপড়ের এই অবস্থা। অতএব এমন বউ বেঁচে থাকার চেয়ে না থাকাই ভালো। কৃষক করজোড়ে বলে, বউ নিয়ে সে খুব সুখেই আছে। কিন্তু কে শোনে কার কথা, হতভাগী বউকে হত্যা করে বাবা কৃষকটির আবার বিয়ে দিয়েছিলেন।

আরেকবার। যুদ্ধক্ষেত্রে মরা লাশের স্তূপ হয়ে গেছে। পচা-গলা মৃতদেহগুলো পূতিগন্ধ ছড়াচ্ছে। গন্ধ অসহ্য হয়ে উঠতে এক সৈন্য বিনীতভাবে বলল, 'আর সহ্য করা যাচ্ছে না, ওগুলো সরিয়ে ফেলা হোক। মহামারী ছড়াতে পারে।'

বাবা বললেন, 'এই, ওর নাকে গন্ধ লাগছে। ওর বুকের ওপর কাঠের গুঁড়ি চাপিয়ে দাও সবাই। গুঁড়ির নিচে থেকে আর গন্ধ লাগবে না তাহলে।' এরপর লোকটাকে মাটিতে শুইয়ে বুকের ওপর চাপানো হলো বিরাট বিরাট কাঠের গুঁড়ি। অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে মারা গেল সৈন্যটি।

বাবার নিষ্ঠুরতার কাহিনি লোকের মুখে মুখে ফিরত। তিনি জিপসিদের গরম পানির কড়াইয়ে ফেলে সেদ্ধ করতেন। সবচেয়ে কুখ্যাত ছিলেন লোককে শূলে চড়ানোর ব্যাপারে। এ জন্যে তাঁকে 'ভ্লাড দি ইমপেলার'ও বলা হতো।

আমাকে নিয়ে মার পালানোর কথা মনে পড়ে না বললেই চলে। কখনো হেঁটে, কখনো ঘোড়ার গাড়িতে, কখনো বা নৌকায় করে শেষমেশ রোমে পৌঁছেছিলাম। ওয়ালাচিয়ার স্মৃতি মন থেকে মুছে দেবার জন্য মা আমার নাম পর্যন্ত বদলে করেছিলেন—মিচেলিনো। যে পরিচারিকাটি ওয়ালাচিয়া থেকে পালাবার ব্যাপারে মাকে সাহায্য করেছিল, তাকে দুর্গ প্রাকারের ওপর থেকে ফেলে দিয়ে হত্যা করা হয়, যাতে মার রোমে আসার খবর আর কেউ জানতে না পারে। পরে সারাদেশে রটিয়ে দেয়া হয়, মা মারা গেছেন।

১৪৬৭ সালে বাবার বন্ধু স্তেফান সেল মেয়ার মোলদাভিয়ার সিংহাসনে বসেন। ১৪৭৫ সালে তিনি রাজা ম্যাথিয়াসের কাছ থেকে বাবাকে মুক্ত করেন।

স্তেফান সেল মেয়ার ও ট্র্যানসিলভেনিয়ার স্তেফান ব্যাথোরির সাহায্যে তিনি ওয়ালাচিয়া পুনর্দখল করে বসরাব সেল ব্যাট্রিনকে বিতাড়িত করেন। ১৪৭৬ সালে হঠাৎ করে বাবার রহস্যজনক মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়।

এই হলো সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এখন আমার ভাইয়েরা বলছে, ওয়ালাচিয়ায় গিয়ে আমার অংশ বুঝে নিতে। সেই রক্তস্নাত ওয়ালাচিয়ায়, ক্যাসল ড্রাকুলাতে কি যাব আবার?

তিন

ঘরে শুয়ে চুপচাপ ভাবছি ঘটনাগুলো গোড়া থেকে, রাজকুমারী সিনজিয়া ঢুকল হন্তদন্ত হয়ে। ঘরের ম্লান মোমের আলোতে তার গোলাপী গাল অপূর্ব লাগছিল। উত্তেজনায় বুক ওঠানামা করছিল দ্রুততালে।

'গিলিয়ানো, তোমাকে মেরে ফেলবে।'

'স্বাভাবিক।' ভৃত্যকে ডেকে মদ দিতে বললাম।

'তোমার দোহাই লাগে, এত হালকাভাবে নিয়ো না সবকিছু। সে ডুয়েলের কথা ভাবছে।'

'তাতে কী? গিলিয়ানোর তলোয়ারের দৌড় আমার জানা আছে। ওসব ভয় আমার নেই, সিনজিয়া। তোমার যুবরাজকে আমি থোড়াই কেয়ার করি।'

'আহা! তুমি একেবারে অবুঝ। তুমি কি ভেবেছ ও নিজে তোমার সঙ্গে ডুয়েলে নামবে?'

'তাহলে?' এবার আমার হতভম্ব হবার পালা।

মদ এসে গেল।

'তাহলে?' আবার জিজ্ঞেস করলাম আমি।

ফায়ারপ্লেসের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সিনজিয়া।

'গিলিয়ানো ডেকেছিল ফ্রানসেসকো গালোকে। ওদের সব কথা আমি শুনেছি। গালো এমনভাবে, এমন পরিস্থিতিতে, তোমাকে লড়াইয়ে আহ্বান করবে, তোমার না করার উপায় থাকবে না।'

অন্য কোনো নাম আমাকে চমকাতে পারত না। সারা রোমে ফ্রানসেসকো গালো ডি প্যানেরার সমান তলোয়ারবাজ লোক আর কেউ নেই। তার সঙ্গে ডুয়েল লড়তে গিয়ে এযাবৎ মারা গেছে মোট সাতচল্লিশজন।

'তোমাকে রোম ছাড়তে হবে,' আমার মনের কথাটাই যেন বলে দিল সিনজিয়া, 'তোমাকে ওরা খুঁজে পাবার আগেই রোম ছাড়তে হবে তোমার।'

রেড ওয়াইনে চুমুক দিতে দিতে মাথা ঝাঁকালাম।

'উত্তেজনা চাপা না পড়া পর্যন্ত তুমি আসতে পারবে না।'

সিনজিয়ার জন্যে এত ভালোবাসা, এত আবেগ, সব ফেলে আমাকে এ মুহূর্তে পালাতে হবে। মানুষের ভালোবাসা-টাসা আসলে একটা কথার কথা। ভাবতাম, সিনজিয়াকে ছেড়ে থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু কই, শুধু মাত্র প্রাণভয় সে-সব ধুয়ে মুছে দিয়েছে।

'হ্যাঁ। পালাতে হবে। এখনি।'

ভৃত্যটিকে ডেকে আস্তাবলের সেরা ঘোড়াটি তৈরি করে পালাজোতে যত টাকা-পয়সা আছে সমস্ত হাজির করতে বললাম।

'খুব বেশিদিন বাইরে থাকবেন, হুজুর?'

'সেটা পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করছে। কখন কী হয়, আমি সংবাদ দেব। তুমি পালাজোর দেখাশোনা করো ঠিকমত।'

'আচ্ছা, হুজুর,' আমার এই দীর্ঘযাত্রার ব্যাপারটা খুব সহজভাবেই নিল বৃদ্ধ লোকটি।

শোবার ঘরে গিয়ে দীর্ঘযাত্রার উপযোগী পোশাক পরে নিলাম। সঙ্গে নিলাম প্রিয় তলোয়ারটি। ক্রুসেড জেতা এক রোমান সৈন্যের তলোয়ার এটা। কোথায় কোন্‌দিক দিয়ে পালাব এসব ভাবতে ভাবতে রাজকুমারীর কথা ভুলেই গেলাম।

পেছনে দরজা বন্ধ করার শব্দে ঘুরে দেখি রাজকুমারী। মিটি মিটি হাসি তার ঠোঁটে। কামনায় উজ্জ্বল দু'চোখ।

দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে ধরলাম। শিরায় শিরায় শিরশিরানি। বাইরে সমুদ্র ফুঁসছে যেন। রক্তে তারই প্রতিধ্বনি।

ক্লান্ত হয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বুঝতে পারিনি। উঠে দেখি অঘোরে ঘুমুচ্ছে সিনজিয়া। চুপচাপ বেরিয়ে এলাম। দূরবর্তী পাহাড়ের মাথায় সূর্যের মুকুট। ডানদিকে ছোটালাম ঘোড়া।

রওনা হলাম এমন এক অভিযানে যার বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানি না।

চার

দুপুরে খাবার জন্যে থামতে হলো। তখন পর্যন্ত জানি না কোথায় চলেছি। খেয়ে উঠে পকেট থেকে ক্যাসল ড্রাকুলার চিঠিটা বের করলাম। আরেকবার পড়লাম। মনে মনে ঠিক করে ফেললাম, ওখানেই যাব।

বারলেট্টার পাহাড়-পর্বত ডিঙানোর পর বিক্রি করতে হলো ঘোড়াটা। সামনে সমুদ্র। ঘোড়ার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। জাহাজে অ্যাড্রিয়াটিক পার হয়ে পৌঁছলাম দুব্রোভনিকে।

চোদ্দ বছর আগে তুরস্কের কাছে বসনিয়ার পতনের পর থেকে এটা স্বাধীন শহর। ১২০৫ সালে বাইজান্টাইন আধিপত্য ত্যাগ করে দুব্রোভনিক ভেনিসীয় সার্বভৌমত্বের অন্তর্গত হয় এবং ১৩৫৮ সালে যুক্ত হয় বসনিয়ার সঙ্গে। আধা ল্যাটিন, আধা স্লেভনিক শহর। এখানে যে-কেউ স্বাধীন ব্যবসা করতে পারে।

দুব্রোভনিক ছাড়ার পরপরই একটু একটু করে তাপমাত্রা কমতে লাগল। ছুটি নিচ্ছে গ্রীষ্ম, জায়গা দখল করতে আসছে শীত। ওয়ালাচিয়াতেও নামে তীব্র শীত, তুষারপাত হয়।

যাত্রাপথের দু'পাশে বনবাদাড়। সত্যি বলতে কি, সারা জায়গাটাই জঙ্গুলে। এসব বনে বিস্তর বাদামি ভালুক, বুনো শুয়োর, নেকড়ে, শেয়াল, বেজি, কৃষ্ণসার হরিণ, লাল হরিণ, ঈগল আর বাজপাখি আছে।

দুব্রোভনিকের উত্তরে মিলিসেবা ক্যাথেড্রাল। রাস্তায় এখানে-সেখানে তুর্কি সৈন্য। বাধা দিল না অবশ্য কেউ। বসনিয়ার বাদক দলের সঙ্গে কথা হলো। কথায় ইটালির টান দেখে ওরা ধরেই নিল, আমি ভেনিসীয়।

মিলিসেবা থেকে ওয়ালাচিয়া সীমান্তের দানিয়ুবের পশ্চিম পাড়ের বিডিন, স্টুডেনিকা হয়ে ক্যালেনিক।

ছোটখাটো স্বাধীন শহর বিডিন। উত্তরে ট্র্যানসিলভেনিয়ান আল্পস। দক্ষিণে বলকান। আশপাশের সর্বত্র তুর্কি আধিপত্যের নিদর্শন থাকলেও অধিবাসীরা নিজেদেরকে বাইজান্টাইনদের উত্তরাধিকারী ভাবতেই পছন্দ করে। কনস্টান্টিনোপলকে তারা মনে করে ধর্ম, শিল্প এবং কৃষ্টির পীঠস্থান।

দুব্রোভনিকে কেনা ঘোড়াটা ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়ল। ওটার নাক-মুখ দিয়ে রক্ত উঠল। বাঁচে কিনা সন্দেহ। বাধ্য হয়ে উঠতে হলো বিডিন সরাইখানায়।

সরাইখানার মালিক স্যাক্সন। হার্ডার। আমার টুটা-ফাটা জার্মান ভাষায় কথা বললাম তার সঙ্গে। নতুন একটা ঘোড়া কেনা যাবে কিনা সে কথা জানতে চাইলাম।

'কেনা তো দূরের কথা, চেষ্টা করাও বৃথা, স্যার,' বলল হের হার্ডার। 'নদীর আশপাশে এখনও লড়াই চলছে। গত মাসে তিন তিনবার আক্রমণ গেছে তুর্কি আর খ্রিষ্টানদের। এখানকার সব ঘোড়াই ধরে নিয়ে গেছে ওরা। সত্যি বলতে কি, দেশটা ছারখার করে দিয়েছে একেবারে!'

চোখ-মুখ কুঁচকে থুক করে একদলা থুতু ফেলল সে আগুনে, 'তুর্কি বলেন আর খ্রিষ্টান বলেন, সব সৈন্যই হাড় বজ্জাত! না, স্যার। বিডিনে নতুন ঘোড়া কেনার আশা, দুরাশা ছাড়া কিছু না।'

আর কী করা। যতদিন ঘোড়াটা সেরে না ওঠে ততদিন অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনো উপায় দেখছি না। হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার চেয়ে কষ্টের কিছু আর নেই পৃথিবীতে।

পাঁচ

'মাফ করবেন,' সরাইখানার ফায়ার প্লেসের সামনে বসা বেঁটেখাটো লোকটি অভিবাদন করে বলল, 'আমার নাম স্ট্রেসার। এরহার্ড স্ট্রেসার। ব্যবসায়ী। টিরগোভিসটি পর্যন্ত যদি আমার সঙ্গে যান, খুব খুশি হব।'

টিরগোভিসটি হলো ওয়ালাচিয়ার রাজধানী। ক্যাসল ড্রাকুলা যেতে হলে ওদিক দিয়েই যেতে হবে। স্যাক্সন ব্যবসায়ীটির চোয়াড়ে চেহারা। চালচলনও বিরক্তিকর। কিন্তু এখানে বসে থাকা তার চেয়ে বেশি বিরক্তিকর।

'আপনার সঙ্গে যেতে পারলে ভালোই লাগবে আমার।'

আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল হের স্ট্রেসার। সঙ্গে সঙ্গে ওয়াইনের অর্ডার দিল। একসঙ্গে খেলাম আমরা। (পরে জেনেছিলাম, দুটো কারণে সে খুব আগ্রহী হয়েছিল আমার ব্যাপারে। প্রথমত, লোকটি ছিল স্নব। আমি ব্যারন জেনে সে ভেবেছিল,

আমার সঙ্গে একই গাড়িতে যেতে পারলে তার খুব পায়াভারী হবে। দ্বিতীয়ত, এখন আশপাশে যখন-তখন লাগছে যুদ্ধ। এসময় খোলা তলোয়ার হাতে যুবক বয়সের কেউ সঙ্গে থাকা খুবই আনন্দের ব্যাপার।)

পরদিন সকালে রুটি, এল এবং পনির দিয়ে সাদামাঠা নাস্তা সেরে রওনা দিলাম আমরা। 'দানুরিয়া' জাহাজটি ধরতে হবে। ওটাই লোকজন পারাপার করে দানিয়ুবে।

গাড়ি তৈরি হলো। বিরাট বিরাট চারটে মোট উঠল গাড়িতে। এখানে জার্মান ভাষা বেশ চালু। জার্মান ভাষায় আমি আবার কাঁচা। কোনরকমে কথা চালাতে পারি। লিখতে পারি না। পড়তেও না। আমার পূর্বপুরুষদের ওপর এত রাগ ছিল মার যে জার্মান শুধুমাত্র ওদের ভাষা বলেই মা আমাকে ওটা ভালো করে শেখাননি।

বিডিনের লোকেরা যেটাকে জাহাজ বলল, সেটা একটা বড় ভেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের গাড়ি, চারটে ঘোড়া উঠতেই আর কোনো জায়গা থাকল না কোথাও। ঢুকুর ঢুকুর করে চলল ভেলাটি। সামান্য পথ যেতে সময় লাগল অনেক। চারজন লোক মিলে দেখাশোনা করে ভেলাটির। তারা কিছুক্ষণ পরপরই স্ট্রেসারকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল, ভাড়া কিন্তু দু'অ্যাসপি (রৌপ্যমুদ্রা)। সারাটা রাস্তা এরা ভাড়া ভাড়া করে জ্বালিয়ে খেল। মনে মনে বিরক্ত হলাম স্ট্রেসারের ওপর। দিতে যখন হবেই, দিয়ে দিলেই তো পারে ভাড়া। কানের কাছে এই ঘ্যানর ঘ্যানর শুনতে হয় না। আসলে বেচারার কাছে কোনো স্থানীয় রৌপ্যমুদ্রা ছিল না। মেলা বাকবিতণ্ডার পর সে জার্মান মুদ্রা 'গ্রোসেন' দিয়ে ভাড়া মেটাল। আমার কাছে কিছু স্বর্ণমুদ্রা আছে। ডুকাট। পরের শহরেই এগুলোর কিছু ভাঙিয়ে রৌপ্যমুদ্রা করে নিতে হবে।

এতগুলো বোঝা, কিন্তু স্ট্রেসারের সঙ্গে শুধু হাতুড়িমুখো এক স্যাক্সন ছাড়া আর কেউ ছিল না। লোকটার নাম আমজা। কোনো বিপদ ছাড়াই দানিয়ুবের ওপারে নামলাম আমরা। আমজা ঘোড়াগুলোকে জুড়ল গাড়ির সঙ্গে। ধীরে ধীরে চলল গাড়ি। সামনে বহুদূরে শুধু পাহাড়ের সারি।

প্রায় দুপুর তখন। একখণ্ড মেঘও নেই আকাশে। বেশ গরম লাগছিল।

ফ্যাশন করতে সবাই ভালোবাসে। কাপড়-চোপড় যখন যেটা নতুন চালু হয় সেটা সঙ্গে সঙ্গে নেয়াটাই ফ্যাশন। কিন্তু ফ্যাশন জিনিসটা সবসময় কার্যকর নয়। কোনো কোনো সময় এটা আবার বেশ বিপদে ফেলে দেয়। যেমন, আজ যদি আমি এখানকার ফ্যাশন মোতাবেক গলাবন্ধ লম্বা গাউন পরতাম, কী অবস্থাটা হতো! শুধু একটা শার্ট গায়ে দিয়ে আছি, তাই মনে হচ্ছে গা সেদ্ধ হয়ে গেল। পারলে এটাও খুলে ফেলি।

এরকম গরমের মধ্যে হঠাৎ একঝলক ঠান্ডা বাতাস গায়ে এসে লাগল। সোনালি সূর্যের আলোর বদলে আকাশের গায়ে ছোপ ছোপ কালো।

লাগামে হেঁচকা টান মেরে গাড়ি দাঁড় করাল আমজা। ছুটন্ত গাড়ি হঠাৎ থেমে যাওয়াতে তারস্বরে প্রতিবাদ জানাল সবগুলো ঘোড়া।

'কী হলো?' জিজ্ঞেস করল স্ট্রেসার।

গাড়ি থেকে মাথা বার করলাম আমরা। আমজা শুধু আকাশের দিকে হাত তুলে দেখাল। অদ্ভুত এক ঘটনা ঘটতে দেখলাম। সারা আকাশের কোথাও একটুকরো মেঘ নেই। অথচ ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে সূর্য। অদৃশ্য কোনো শক্তি যেন টেনে

নিচ্ছে সূর্যকে। পুরোপুরি আড়াল হয়ে গেল সূর্য। আশপাশে ছড়িয়ে পড়ল ছায়া। যেমন গরম ছিল, তেমনি হঠাৎ করেই নেমে পড়ল ঠান্ডা। শীতের তীব্রতায় কাঁপছে শরীর।

হাঁটু গেড়ে বসে ক্রুশ আঁকতে লাগল আমজা। বিড়বিড় করে কী যেন বলছে সে নিজের ভাষায়, যার একবর্ণও বুঝলাম না। একটা শব্দ অসংখ্য বার বলল সে—'ভারকোলাক'।

আবার বদলাতে শুরু করল সবকিছু। কমতে লাগল আকাশের কালো। চারপাশের ছায়া উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হলো। ছায়ায় ঢাকা কালো সমতলভূমি থেকে অন্ধকারকে হটিয়ে দিল উজ্জ্বল আলো। আগের মতোই স্বাভাবিক হয়ে গেল আবহাওয়া।

স্ট্রেসার ও আমি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। আমজা তখনও হাঁটু গেড়ে বসে আছে। হাত দিয়ে ইশারা করে ক্রুশ আঁকছে। বিড়বিড় করছে এক ধ্যানে।

'ভয়ের কিছু নেই,' আমাকে ভরসা দিল স্ট্রেসার, 'এটা প্রাকৃতিক ব্যাপার। জিনিসটা আরেকবার দেখেছিলাম। কতদিন হবে, কতদিন হবে, এই বছর পাঁচেক আগে। ওটা ধূমকেতু। ১৪৭২ সালে যেটা দেখেছিলাম সেটা অবশ্য এত কালো ছিল না। এটাতে ভয়ের কিছু নেই।'

রোমে জ্যোতির্বিদদের মুখে এ ধরনের কথা শুনেছি। ১৪৫৬ সালে এরকম একটা ধূমকেতুর আবির্ভাব হয়েছিল। জ্যোতির্বিদরা বলেন, এ ধরনের ধূমকেতু পৃথিবীতে অভিশাপ বয়ে আনে। সে সময় তুর্কি এবং খ্রিষ্টানদের ঘোর যুদ্ধ হচ্ছিল। একটি প্রার্থনা সবার মুখে মুখে ফিরত, 'হে ঈশ্বর! শয়তান, তুর্কি আর ধূমকেতুর হাত থেকে আমাদের বাঁচাও।' জীবনে এই প্রথম ধূমকেতু দেখলাম আমি। আবার আকাশের দিকে চাইলাম। ধূমকেতুটি নেই।

আমজা থরথর করে কাঁপছিল। ধূমকেতু তার ওপর এমনই প্রভাব ফেলেছে, এখনও চোখ-মুখ রক্তশূন্য হয়ে আছে। বিড়বিড় করে কী বলছিল, বুঝিয়ে দিতে বললাম স্ট্রেসারকে।

'ওসব বাদ দিন। স্থানীয় কুসংস্কার সব,' হাসল সে।

'ভারকোলাক মানে কী?'

আমার মুখে শব্দটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠে আবার বুকে ক্রুশ আঁকল আমজা। বকর বকর শুরু করল আবার। মুখ বিকৃত করল স্ট্রেসার।

'এত কুসংস্কার শালাদের। ''ভারকোলাক'' হলো একধরনের ভ্যাম্পায়ার। এরা স্বর্গে গিয়ে চাঁদ বা সূর্য গিলে খায়। আমজা বলছে, ভারকোলাক সূর্যকে গিলে ফেলেছে। ওয়ালাচিয়ার লোকেরা খুবই কুসংস্কারাচ্ছন্ন।'

আমাদের কথাবার্তা চুপচাপ শুনছিল আমজা। শুধু 'ভারকোলাক' শব্দটা কানে যেতে প্রতিবারই ক্রুশ আঁকছে বুকে।

আবার আকাশের দিকে তাকালাম, যদি কোনো নতুন জিনিস দেখা যায় এই আশায়। চিৎকার করে উঠল আমজা।

বুড়ো একটা মানুষ এমন শিশুর মতো চিৎকার করে উঠবে কল্পনাও করতে পারিনি। আমাদের সামনে হাঁটু গেড়ে বসল সে। থরথর করে কাঁপছে। উদ্‌ভ্রান্ত

চোখ-মুখ। যেন স্বপ্নের ঘোরে বিড়বিড় করে চলল। এবারও কিছুই বুঝলাম না। কিন্তু গতবারে যেমন 'ভারকোলাক,' এবারেও তেমনি 'মরই' শব্দটা বারবার বলছে, এটা খেয়াল করলাম।

ভীষণ বকাবকি শুরু করল হের স্ট্রেসার। কিন্তু সে বকাবকি যেন কানেই ঢুকল না আমজার। বারবার ওই 'মরই' 'মরই'—শব্দটা উচ্চারণ করে চলল সে। যেন জাদুর কোনো মন্ত্র। হাতের ছড়ি দিয়ে বুড়োকে কয়েক ঘা কষাল স্ট্রেসার। তবু কোনো ভাবান্তর হলো না আমজার মধ্যে। স্ট্রেসারের হাত চেপে ধরলাম যেন বুড়ো লোকটাকে আর মারতে না পারে। একহাত দিয়ে মুখ ঢেকে এমনভাবে পিছিয়ে গেল আমজা যেন ওর মুখে কেউ গরম পানি ঢেলেছে।

'মরই,' ফিসফিস করে বলল সে, 'মরই! মরই! ড্রাকুলা!!!'

জমে গেলাম আমি। কী শুনলাম, যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। বুড়ো মানুষটা আমাকে চিনল কী করে!

'আমজা,' শান্তভাবে ডাকলাম।

লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নামল বুড়ো। পেছন দিকে আর একবারও না তাকিয়ে সামনের গাছপালার মধ্য দিয়ে ছুট দিল। কিছুক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে থাকলাম দু'জনেই।

'হারামজাদা,' ফুঁসে উঠল স্ট্রেসার, 'সামনের গ্রামটা এখান থেকে মাইল বারো হবে। ওখানেই পেয়ে যাব কোচোয়ান। সে নিশ্চয় এই বুড়ো হারামজাদাটার মতো পাগল হবে না। কিন্তু মুশকিল হলো, আমি তো গাড়ি চালাতে জানি না।'

'চিন্তার কিছু নেই। গাড়িটা আমি চালাতে পারব মনে হয়।'

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সে। আমি উঠে বসলাম কোচ বক্সে। চলল গাড়ি। কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ি চালানোর কায়দা অনেকটা রপ্ত হয়ে গেল। আকাশে গনগনে সূর্য। গলদঘর্ম হয়ে গেলাম একেবারে। কিছুক্ষণ আগেই একটা আজব কাণ্ড ঘটে গেছে এখানে, বিশ্বাসই হয় না।

'ব্যাপারটা খুবই আশ্চর্য মনে হচ্ছে। গত পাঁচ বছর থেকে আমজা আমার কাছে আছে, কিন্তু এমন তো কোনদিন করেনি। লোকটার বহু কুসংস্কার ছিল, এটা ঠিক। তবু এরকম করার কোনো কারণ বুঝলাম না। বুড়ো বলত, সে নাকি অনেক কিছুই আগে থেকে বুঝতে পারে।'

'বারবার ওটা কী বলছিল আমজা?'

'মরই মানে কী আমিও জানি না। তবে ড্রাকুলা মানে বুঝি। তবে এসব কেন বলছিল তা জানি না।'

'ড্রাকুলা?' প্রশ্ন করলাম।

'হ্যাঁ। ড্রাকুলা। ওই নামে ঈশ্বরের অভিশাপ আছে।' থুক করে একদলা থুতু ফেলল সে।

'কেন?'

'ড্রাকুলা ওয়ালাচিয়ার যুবরাজদের উপাধি। কিন্তু ড্রাকুলা বলতে আমরা সবাই ভ্লাড তেপ্‌স্‌কেই বুঝি। রক্তখেকো পিশাচ একটা। জীবিত থাকতে সে যত কাণ্ড করে গেছে, বললে সারাদিনেও শেষ হবে না। গত ডিসেম্বরে মারা গেছে জানোয়ারটা। পৃথিবীর সবাই হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে।'

'একটু খুলে বলুন তো।'

'উয়েটজারল্যান্ডের বারকেনডর্ফে আমার বাড়ি। ভ্লাড ড্রাকুল পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে বারকেনডর্ফ। পুরুষ, মেয়ে, শিশুদের প্রায় সবাইকে হয় পুড়িয়ে, না হয় শূলে চড়িয়ে মেরেছে। তাদের দোষ কী জানেন? দোষ একটাই। তারা স্যাক্সন।'

'আমি তো শুনেছি, ওয়ালাচিয়াতে খুবই জনপ্রিয় ছিল ড্রাকুল। সে বিনা কারণে নিশ্চয়ই স্যাক্সনদের শাস্তি দেয়নি। স্যাক্সনরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। চেষ্টা করেছিল ভ্লাড ডানকে সিংহাসনে বসাবার।'

'চেষ্টা তো করবেই। রক্তলোভী একটা ম্যানিয়াককে সরাবার চেষ্টা করেছিলাম আমরা। ফ্যাগারাস দুর্গে স্যাক্সনদের সঙ্গে ড্রাকুলার সংঘর্ষ হয়। দুঃখের বিষয়, হেরে যাই আমরা। ভ্লাদিস্লাভ ডানকে দিয়ে নিজের হাতে নিজের কবর খুঁড়িয়ে নেয় ড্রাকুলা। তারপর তার শিরশ্ছেদ করে। তারপরই শুরু হয় সারা ওয়ালাচিয়া জুড়ে স্যাক্সন নিধন।'

পকেট থেকে কিছু প্যামফ্লেট বের করে দেখাল আমাকে স্ট্রেসার, 'এগুলো ড্রাকুলার অপকর্মের সাক্ষী। সারা ইয়োরোপে সবাইকে জানানোর জন্যে এই প্যামফ্লেটগুলো লিখি আমরা। ওহ্-হো! খামোকা আপনাকে দেখাচ্ছি এসব। আপনি তো আবার জার্মান জানেন না।' পকেটে আবার কাগজগুলো ঢুকিয়ে রাখল সে।

'আরও শুনবেন?' চোখ সরু করে বলল স্ট্রেসার, 'একবার উয়েটজারল্যান্ডের প্রায় সব ব্যবসায়ীকেই মেরে ফেলে ড্রাকুলা। মারার পরও তার শান্তি হয়নি। সবগুলো মৃতদেহকে আবার শূলে চড়িয়েছিল। এত শূল পুঁতেছিল যে, দূর থেকে মনে হয়েছে একটা বন। মানুষ মারা তার নেশা ছিল। মানুষ ঠিক নামই দিয়েছে তার ভ্লাড তেপ্স্, দি ইমপেলার।

'একবার তুরস্ক থেকে কয়েকজন রাজদূত আসে ড্রাকুলার দুর্গে। দুর্গে ঢুকে ড্রাকুলাকে দেখেও তারা মাথার ফেজ টুপি খোলে না। সম্মান প্রদর্শন করার ওটাই ছিল তুর্কি রীতি। ড্রাকুলা জানতে চাইল, কেন তারা টুপি খুলে সম্মান দেখাল না তাকে? তারা বলল, কাউকে সম্মান প্রদর্শন করতে তাদের দেশে ফেজ না খোলাটাই প্রথা। ড্রাকুলা বলল, বেশ বেশ। তোমাদের প্রথা তোমরা তো মানবেই। তবে এ প্রথা যেন আরও ভালোভাবে মানতে পার, সে ব্যবস্থা করছি। এরপর তার নির্দেশে লোহার কাঁটা দিয়ে মাথার চামড়া ফুটো করে টুপিগুলো মাথার সঙ্গে আটকে দেয়া হয়। ড্রাকুলা বলে, যাও তোমাদের সুলতানকে গিয়ে বল, এ ধরনের অসম্মানে তার অভ্যাস থাকতে পারে, আমার নেই। তাকে আমি দূত পাঠাতে বলেছি, তার দেশের প্রথা পাঠাতে বলিনি। এমনই ভয়ঙ্কর বর্বর লোক ছিল ড্রাকুলা!'

হের স্ট্রেসারের কথাগুলো বেশি বেশি মনে হলো আমার। রাজ্য চালাতে গেলে প্রয়োজনে এইরকম নিষ্ঠুর সবাইকে হতে হয়। স্যাক্সনরা যা করেছে বাবার জায়গায় অন্য কেউ ওয়ালাচিয়ার শাসক হলেও একই রকম করত। আরও কিছু বলতে যাব, 'অঁক' করে একটা শব্দ করল স্ট্রেসার।

হাত কপালে রেখে সূর্যের আলো থেকে চোখ আড়াল করে কী যেন দেখল সে দূর পাহাড়ের দিকে চেয়ে। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখি কিছু ঘোড়সওয়ার ধুলো উড়িয়ে এদিকেই আসছে।